

ছাগল পালনে ভাগ্য বদলেছে জোসনা বেগমের



জোসনা বেগম ও তাঁর ছাগল

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের উন্নয়নের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। এ কর্মসূচির একটি উল্লেখযোগ্য ছাগল পালন কর্মসূচি। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে ছাগল পেয়ে ভাগ্য বদলে গেছে জোসনা বেগমের।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর রাজবাড়ী জেলার সহযোগী সংস্থা ‘সমন্বিত প্রমিলা মুক্তি প্রচেষ্টা’কে ‘দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের মধ্যে ছাগল পালন প্রশিক্ষণ ও বিনামূল্যে ছাগল প্রদান’ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ১০ম পর্যায়ে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করে। সমন্বিত প্রমিলা মুক্তি প্রচেষ্টা রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার জঙ্গল ইউনিয়নের অলংকারপুর, জঙ্গল, নতুন ঘুরঘুরিয়া, পটরা, দোনাইখালি, ধর্মতলা ও মহারাজপুর গ্রামে এবং বালিয়াকান্দি ইউনিয়নের বালিয়াকান্দি গ্রাম, দুর্গাবতী, জাবরখোল, মৌপুরী, কুন্দুপাড়া, দুবলাবাড়ি, শালমারা, শ্রীপুর, পশ্চিম বালিয়াকান্দি ও খোদম্যাব্রামি গ্রামে ৪০ জন দরিদ্র ও হতদরিদ্র বাছাই করে প্রত্যেককে ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে ১টি করে মা ছাগল প্রদান করে।

সদর ইউনিয়নের শ্রীপুর গ্রামের মৃত হাকিম শেখের স্ত্রী জোসনা বেগম। দুটি কন্যা সন্তান রেখে হাকিম শেখ ৭ বছর আগে মারা যান। দুটি কন্যা সন্তান নিয়ে অভাবে দিন কাটে জোসনা বেগমের। সমন্বিত প্রমিলা মুক্তি প্রচেষ্টা জরিপের মাধ্যমে জোসনা বেগমকে নির্বাচন করে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে ২০১৯ সালে তাঁকে একটি মা ছাগল বিনামূল্যে প্রদান করে। একটি মা ছাগল হতে ৭টি বাচ্চা হয়। তিনি ১টি ছাগল ৮ হাজার টাকায় বিক্রি করে ছাগল রাখার ঘর তৈরি করেছেন এবং এখন ৭টি ছাগল রয়েছে। ৭টি ছাগলের অনুমানিক বাজার মূল্য অর্ধ লাখ টাকা। জোসনা বেগমের স্বপ্ন একটি ছাগলের খামার করা।

হতদরিদ্রদের মাঝে ছাগল প্রদান অনুষ্ঠানে বালিয়াকান্দি উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান খোদেজা বেগম উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, এ ছাগল তৃণমূলে হতদরিদ্রদের ভাগ্য বদলে দৃষ্টান্ত রাখবে, আমি আশা করি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এ কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখে বালিয়াকান্দির হতদরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

বিএনএফ হতে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন পেয়ে স্বপ্ন দেখেছেন হুমায়রা

২১ বছর বয়সী এক ছেলে সন্তানের জননী মোসাঃ হুমায়রা খাতুন। স্বামী মোঃ হাসান সরদার। তাঁর স্বামী রাজমিস্ত্রীর কাজ করেন। শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী সন্তান মিলে পাঁচ জনের সংসার তাঁদের। খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার শিয়ালীডাঙ্গা গ্রামের অন্তর্গত নালুয়া নদীর চরভরাটি খাস জমিতে অস্থায়ী বন্দোবস্তে তাঁদের বসবাস। পরিবারটি সম্পূর্ণ ভূমিহীন।



বিএনএফ হতে প্রাপ্ত সেলাই মেশিনে কাজ করছেন হুমায়রা

খুলনা জেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা ‘লোকজ’ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে নবম পর্যায়ে ‘দর্জি বিজ্ঞান প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর আত্মকর্মসংস্থান’ নামে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লোকজ বটিয়াঘাটা উপজেলার গঙ্গারামপুর, বটিয়াঘাটা সদর এবং ভান্ডারকোট ইউনিয়ন হতে ২২ জন নারীকে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন করে। এ ২২ জনের একজন হুমায়রা খাতুন। ২২ জন উপকারভোগীকে সপ্তাহে চার দিন করে ছয় মাস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে লোকজ সংস্থা প্রত্যেককে বিনামূল্যে একটি করে নতুন বাটারফ্লাই সেলাই মেশিন প্রদান করে। সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানে বটিয়াঘাটা উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব আহমেদ জিয়াউর রহমান, গঙ্গারামপুর ইউপি চেয়ারম্যান শেখ মোঃ হাদী উজ্জ্বল জামান হাদী, লোকজ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব দেব প্রসাদ সরকার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সেলাই মেশিন পাওয়ার পর উপকারভোগী ২২ জন নারী তাঁদের বাড়িতে কাজ শুরু করেন। হুমায়রা খাতুন প্রধানতঃ স্যালোয়ার, কামিজ, ফ্রগ, গোল ফ্রগ, ব্লাউজ, প্লাজু, পেটিকোট, বাচ্চাদের পোশাক, ফতুয়া, চোজ পায়জামা এবং লুঙ্গি সেলাই করে থাকেন। এ কাজে মাসে গড়ে ৫,৫০০-৬,৫০০ টাকা আয় করে থাকেন। এছাড়া করোনা সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে তিনি নিজের তৈরি দৈনিক ৩-৪টি মাস্ক সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মানুষকে প্রদান করে চলেছেন। তিনি জানান, এ পর্যন্ত এক হাজারের বেশি মাস্ক বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন। বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন পেয়ে তাঁদের সংসারে অনেক উপকার হয়েছে বলে জানান হুমায়রা। ‘স্বামীর রোজগারের পাশাপাশি হুমায়রা আয় করে পরিবারের সহায়তা করতে পারায় সংসারে সচ্ছলতা আসছে।

বিএনএফ হতে চটপটি ও ফুচকার উপকরণ ও ভ্যান পেল মাদারীপুর সদর উপজেলার ৮ জন হতদরিদ্র

মাদারীপুর জেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সহযোগী সংস্থা সমাধান সমাজ উন্নয়ন সংস্থা বিএনএফ হতে ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা অনুদান পায়। এ অনুদানের অর্থে এসএসইউএস ভ্যানে নিরাপদ খাদ্য তৈরি ও বিক্রি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। সংস্থাটি ৮ জন হতদরিদ্রের প্রত্যেককে টিনের পাত ও কাঁচে ঘেরা এবং টিনের পাতের ছাউনিযুক্ত চার চাকা বিশিষ্ট ভ্যান এবং ৫ হাজার টাকা মূল্যের চটপটি/ফুচকা তৈরির উপকরণ (টিনের বড় পাত্র, ডাল, ফুচকা, কাপ-পিরিচ, প্লেট, মসলা, তেঁতুল, ইত্যাদি) প্রদান করে। প্রতিটি ভ্যান তৈরি করতে ২৭ হাজার টাকা ব্যয় হয়।

সদর উপজেলার পানিচত্র গ্রামের শাজাহান বেপারী আগে রিকশা চালতেন এবং মাঝে মাঝে অন্যের চটপটির দোকানে সহযোগী হিসেবে কাজ করতেন। এ কাজ করে দৈনিক প্রায় ৩০০-৪০০ টাকা আয় হতো।

বিএনএফ এর অনুদানে ভ্যান পেয়ে অভাব দূর হলো রাজবাড়ীর সিরাজ সরদারের



বিএনএফ হতে প্রাপ্ত ভ্যানে যাত্রী বহন করছেন সিরাজ সরদার

রাজবাড়ী জেলার কালুখালী উপজেলার চরচিলোকা গ্রামের গণি সরদারের ছেলে মো. সিরাজ সরদার পেশায় ভ্যানচালক। নিজস্ব একটু জায়গার উপর কোন রকমে একটি ঘর তুলে বসবাস করেন। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে। এক ছেলে দিনমজুরে, অন্য ছেলে ৮ম শ্রেণিতে ও মেয়ে ৫ম শ্রেণিতে পড়ে। দরিদ্রের কষাঘাতে নিষ্পেষিত সিরাজ সরদার। তিনি প্রতিদিন ১৫০-২০০ টাকায় ভ্যান ভাড়া নিয়ে চালাতেন। যে আয় হতো তা থেকে ভ্যান মালিককে ১৫০-২০০ টাকা দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকতো তা দিয়ে চলতে হতো তাঁকে। এ আয় দিয়ে সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ায় স্ত্রী অন্যের বাড়িতে কাজ করে কোন রকমে দুবেলা দুমুঠো খেয়ে না খেয়ে দিনাতিপাত করতে হতো। সামর্থ্য না থাকায় নিজে ভ্যান কিনতে পারেননি। কোন কোন দিন ভ্যান ভাড়া না পাওয়ায় দিনমজুরের কাজ করতে হতো। আবার কোন কোন দিন দিনমজুরের সুযোগ পায় না। সে দিন অলস বসে থাকতে হতো। এমন দিনে না খেয়েই থাকতে হতো তাঁদের। বিএনএফ “ভ্যান গাড়ি বিতরণ” কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য “পল্লী মুক্তি সংস্থাকে ২.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। সিরাজ সরদার জানতে পারেন বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থা “পল্লী মুক্তি সংস্থা (পিএমএস)” দরিদ্র পরিবারের যারা ভ্যান চালাতে পারেন

তাদের ভ্যান দিয়ে থাকে। সিরাজ সরদার পিএমএস এর সাথে যোগাযোগ করলে পিএমএস সরেজমিনে তাঁর বিষয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে তাঁকে একটি ভ্যান প্রদান করে।

ভ্যান পেয়ে তিনি খুবই খুশি। বিনামূল্যে একটি ভ্যান পাওয়ায় এখন আর ভ্যান ভাড়া নিতে হয় না। ফলে ভ্যান ভাড়া নেওয়া বাবদ প্রতিদিন ১৫০-২০০ টাকা বেঁচে যায়। এতে তাঁর আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি প্রতিদিন ভ্যান চালিয়ে ৫০০-৬০০ টাকা, কোন কোন দিন আরো বেশি আয় করে থাকেন। এখন সংসারের দৈনন্দিন চাহিদা মিটিয়ে প্রতি মাসে ১,৫০০/- টাকা সঞ্চয় করছেন সিরাজ সরদার।

ভেড়া পেয়ে আনজু বেগম এখন কারো বোঝা নয়

বগুড়া জেলার আটাপাড়া গ্রামের হতদরিদ্র রিক্সা চালক জহুরুল। হতদরিদ্র বাবা-মার সাত সন্তানের মধ্যে ২য় সন্তান আনজু বেগম। আনজু বেগম নিজের পছন্দমত বিয়ে করেন জহুরুলকে। বিয়ের ৬ মাস পর তিনি বুঝতে পারেন তাঁর স্বামীর আরও ১টি স্ত্রী আছে। বিয়ের আগে স্বামী এ বিষয়টি গোপন করেন। আনজু এ বিষয়টি মেনে নিতে না পারায় স্বামী তাঁর সাথে খারাপ ব্যবহার করতে থাকেন। এরমধ্যে আনজু একটি কন্যা সন্তানের মা হন। স্বামীর সাথে মনোমালিন্য হওয়ায় স্বামী থেকে প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণ না পাওয়ায় খুব কষ্টের মধ্যে দিন অতিবাহিত করতে থাকেন আনজু বেগম। এক প্রকার বাধ্য হয়েই আনজু বেগম মেয়েকে নিয়ে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে যান। বাপের অবস্থাও ভালো না থাকায় তিনি সিদ্ধান্ত নেন দরিদ্র বাপের বোঝা না হয়ে নিজে কিছু করার। তিনি লেখাপড়া জানতেন না আবার বিশেষ কোন প্রশিক্ষণও ছিল না।



আনজু বেগমের ভেড়া

অগত্য তিনি আটাপাড়া বস্তিতে ছোট একটি ঘর ভাড়া নেন এবং অন্যের বাড়িতে কাজ শুরু করেন। ২০১৪ সালে বগুড়া জেলার “আলোর পথে” এর কর্মী মাবিয়া খাতুনের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি তাঁর সমস্যার কথা মাবিয়াকে খুলে বলেন এবং সহযোগিতা কামনা করেন। মাবিয়া আলোর পথে নির্বাহী পরিচালকসহ অন্যদেও সাথে আলাপ করে আনজু বেগমকে সমিতিতে ভর্তি করিয়ে নেন। আনজু সমিতিতে ভর্তি হয়ে নিয়মিত সঞ্চয় করতে থাকেন। আলোর পথে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে অনুদান পায়। অনুদানে গৃহীত কর্মসূচির আওতায়

আনজু বেগমকে ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে ভেড়া পালনের উপর ২ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে একটি ভেড়ি প্রদান করা হয়। অন্যের বাড়িতে কাজের পাশাপাশি তিনি ভেড়ির বিশেষ যত্ন নিতে থাকেন। আস্তে আস্তে তাঁর ভেড়ার সংখ্যা বাড়তে থাকে। ভেড়ার সাথে মা-মেয়ে কেউ না কেউ থাকে। কারণ ভেড়া একা একা থাকলে কুকুরে কামড় দিয়ে থাকে। এতে ভেড়া মারা যায়। দেখা যায়, একটি ভেড়ি প্রতি ৬ মাসে ২টি বাচ্চা দিয়ে থাকে। কোন রোগ/সমস্যা দেখা দিলে তিনি পশু ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করান।

বিগত সাত বছরে আনজু ১টি ভেড়ি থেকে ৩২ টি ভেড়া/ভেড়ি পান। তিনি ২৫টি ভেড়া/ভেড়ি ১.৫০ লক্ষ টাকায় বিক্রি করেন। এ টাকা দিয়ে মাঠে ২৫ শতক জমি লিজ নিয়ে আবাদ করতে থাকেন। এ জমি থেকে ভালো আয় হতে থাকে। তিনি মেয়েকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়িয়ে ভালো ছেলের সাথে বিয়ে দিতে সমর্থ হন। বর্তমানে তাঁর ৭টি ভেড়া/ভেড়ি আছে। এ ৭টির মধ্যে ৩টি ভেড়ি বাচ্চা দবে। বর্তমানে আনজু বেগম আগের তুলনায় অনেক ভালো আছেন। তিনি মনে করেন ভেড়া পালনে তাঁর ভাগ্য ফিরেছে। তাঁর স্বপ্ন ছিল নিজের পায়ে দাঁড়ানো। সে স্বপ্ন আজ পূরণ হয়েছে। তিনি এখন আর কারো বোঝা নন। তিনি গ্রামে আরও জমি কিনে ভেড়ার খামার করার স্বপ্ন দেখছেন।

বিএনএফ হতে একটি বকনা বাছুর পেয়ে পাঁচবিবির মামনি হেমরম এখন স্বাবলম্বী

জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই দরিদ্র। অধিকাংশ অন্যের জমি বা খাস জমিতে বসবাস করে থাকেন। তাঁরা বছরের কিছুদিন অন্যের বাড়ি/ জমিতে দিনমজুরের কাজ করে খুবই কষ্টে জীবনযাপন করে থাকেন। সারাবছর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকায় অর্থের অভাবে সন্তানসহ নিজেরা তিন বেলা খাবার খেতে পারেন না। অনুদান প্রদান করা হয়। আইএসডিও উক্ত অনুদানে পাঁচবিবি উপজেলার রঘুনাথপুর ও পূর্ব কড়িয়া গ্রামের বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও দরিদ্র সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ৮টি পরিবারের ৮ জন মহিলা ও পুরুষকে বিনামূল্যে ৮টি বকনা বাছুর বিতরণ করে।



বিএনএফ হতে প্রাপ্ত গরুর সাথে মামনি হেমরম ও তাঁর স্বামী গুমির মুর্মুর

এ ৮ জন উপকারভোগীর একজন রঘুনাথপুর গ্রামের দরিদ্র ও বেকার গুমির মুর্মুর স্ত্রী মামনি হেমরম। আইএসডিও মামনি হেমরমকে বিনামূল্যে একটি গাভি প্রদান করে। তিনি অন্যের বাড়ি ও জমিতে কাজের পাশাপাশি গাভিটি

যত্নসহকারে পালন করতে থাকেন। গাভিটি উন্নত জাতের হওয়ায় ফ্রিজিয়ান বীজ প্রয়োগের করলে উন্নত জাতের ঐঁড়ে বাছুর হয়। তাঁরা প্রতিদিন ৩-৪ লিটার দুধ পান। কিছু দুধ পরিবারের জন্য রেখে বাকি দুধ বিক্রি করে গাভি ও নিজেদের খাবার ক্রয় করেন।

তাঁর স্বামী দর্জির কাজ শিখে স্থানীয় বাজারে টেলার্সের কাজ করে প্রতিদিন গড়ে ৩০০ টাকা আয় করতেন। ঐঁড়ে বাছুরটি একসময় ৭০ হাজার টাকায় বিক্রি করেন। এ টাকা হতে ৬০ হাজার টাকায় ১৬ শতক জমি লিজ নেন এবং বাকি টাকা ও সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে ১টি বিদ্যুৎচালিত সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। তাঁর স্বামী টেলার্স হতে অর্ডারি কাপড় এনে নিজ বাড়িতে সেলাই করেন। স্বামীর সেলাইয়ের কাজে সহযোগিতার পাশাপাশি তিনি সেলাই শিখেন। এখন প্রতিদিন গড়ে ৫০০ টাকা আয় করে থাকেন।

পরবর্তীতে গাভিটি আর বাচ্চা না দেওয়ায় সেটি বিক্রি করে ১টি বকনা বাছুর ক্রয় করেন। স্বামী-স্ত্রীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হওয়ায় মামনি হেমরম এখন স্বাবলম্বী। মামনি হেমরমসহ উক্ত কর্মসূচির ৮ জন উপকারভোগীর সাফল্য দেখে প্রতিবেশিরা গাভি পালনে উৎসাহী হয়েছেন।

তাঁর স্বামী দর্জির কাজ শিখে স্থানীয় বাজারে টেলার্সের কাজ করে প্রতিদিন গড়ে ৩০০ টাকা আয় করতেন। ঐঁড়ে বাছুরটি একসময় ৭০ হাজার টাকায় বিক্রি করেন। এ টাকা হতে ৬০ হাজার টাকায় ১৬ শতক জমি লিজ নেন এবং বাকি টাকা ও সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে ১টি বিদ্যুৎচালিত সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। তাঁর স্বামী টেলার্স হতে অর্ডারি কাপড় এনে নিজ বাড়িতে সেলাই করেন। স্বামীর সেলাইয়ের কাজে সহযোগিতার পাশাপাশি তিনি সেলাই শিখেন। এখন প্রতিদিন গড়ে ৫০০ টাকা আয় করে থাকেন।

পরবর্তীতে গাভিটি আর বাচ্চা না দেওয়ায় সেটি বিক্রি করে ১টি বকনা বাছুর ক্রয় করেন। স্বামী-স্ত্রীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হওয়ায় মামনি হেমরম এখন স্বাবলম্বী। মামনি হেমরমসহ উক্ত কর্মসূচির ৮ জন উপকারভোগীর সাফল্য দেখে প্রতিবেশিরা গাভি পালনে উৎসাহী হয়েছেন।